بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

# বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
34

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 27 শে অক্টোবর, 2016 27 ইখা, 1395 হিজরী শামসী 25 মহর্‌রম 1437 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

**আল্লাহ্‌র বিধান এইরূপ যে, তিনি প্রথমে স্বীয় নবীগণকে ও রসূলগণকে এতখানি অবকাশ দেন যে, তাঁহাদের নাম পৃথিবীর অনেক অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হইয়া যায়। এবং তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল প্রমাণসহ তাঁহারা লোকদের উপর 'হুজ্জত' কায়েম করেন।**

**খোদার আদেশে খোদার রসূলগণকে খ্যাতি দান করা হয় এবং খোদার ফেরেশতাগণ যমীনে অবতীর্ণ হন এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে এক কথা প্রবিষ্ট করিয়া দেন যে, তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহা সঠিক নহে। তখন এইরূপ লোক সঠিক পথের অন্বেষণে লাগিয়া যায়।**

**বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)**

**প্রশ্ন (৬)**

দাওয়াত পৌঁছিয়া যাওয়া বলিতে কি বোঝায়?

**উত্তর:**

দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছে সে লোকদেরকে অবহিত করিবে যে, আমি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছি এবং তাহাদিগকে তাহাদের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিবে যে, অমুক অমুক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা ভ্রান্তির মধ্যে আছ অথবা অমুক অমুক আমলের ক্ষেত্রে তোমরা উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল-প্রমাণ দ্বারা নিজের সত্যতা প্রমাণ করিবে। আল্লাহ্‌র বিধান এইরূপ যে, তিনি প্রথমে স্বীয় নবীগণকে ও রসূলগণকে এতখানি অবকাশ দেন যে, তাঁহাদের নাম পৃথিবীর অনেক অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল প্রমাণসহ তাঁহারা লোকদের উপর 'হুজ্জত' (দলিল-প্রমাণ সহ কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করা) কায়েম করেন। তাহাদিগকে পৃথিবীতে অসাধারণ খ্যাতি দান করা হয় এবং উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সহিত 'হুজ্জত' কায়েম করা খোদা তা'লার নিকট অসম্ভব কাজ নহে। যেমন তোমরা দেখিয়া থাক, যে মুহূর্তে আকাশের এক প্রান্তে বিদ্যুত চমকায় উহা তাৎক্ষণিকভাবে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি খোদার আদেশে খোদার রসূলগণকে খ্যাতি দান করা হয় এবং খোদার ফেরেশতাগণ যমীনে অবতীর্ণ হন এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে এক কথা প্রবিষ্ট করিয়া দেন যে, তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহা সঠিক নহে। তখন এইরূপ লোক সঠিক পথের অন্বেষণে লাগিয়া যায়। অন্যদিকে খোদা তা'লা এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যে, যুগ - ইমামের সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া যায়। বিশেষভাবে এই যুগতো এইরূপ যে, কয়েক দিনের মধ্যে বদনামীর সহিত একটি নামী ডাকাতের নামও পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তবে, খোদা তা'লার বান্দা, যাহার সহিত সর্বদা খোদা আছেন, তাহার নাম কি এই পৃথিবীতে ছড়াইতে পারে না? তিনি কি গুপ্ত থাকিবেন? তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ার ব্যাপারে কি খোদা শক্তিমান নহেন? * আমি দেখিতেছি খোদা তা'লার ফযল এইরূপে আমার সাথে আছে যে, আমার জন্য 'হুজ্জত' কায়েমের নিমিত্তে এবং স্বীয় নবী করীমের ধর্ম প্রচারের জন্য খোদা তা'লা ঐ সকল উপকরণ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা ইতোপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ আমার সময়ে ট্রেন, তার, ডাক ব্যবস্থা এবং স্থল ও জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার দরুন বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এখন সকল দেশ যেন একই দেশ হইয়া গিয়াছে, বরং একই শহরে পরিণত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমণ করিতে চাহে তবে অল্প সময়ের মধ্যে মমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পুস্তক লেখা খুব সহজ সরল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যে সকল বিশাল গ্রন্থের কয়েক কপি এক শত বৎসরেও লেখা যাইত না, ইহাদের কয়েক লক্ষ কপি এখন দুই এক বৎসরে লেখা যায় এবং সকল দেশেই মুদ্রিত করা যায়। সব দিক হইতে তবলীগের জন্যও এত সহজ উপায় ও উপকরণের উদ্ভব হইয়াছে যে, আমাদের দেমে আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে ইহাদের নাম নিশানা ছিল না। আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বেকার সময়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ ছিল। কিন্তু এখন মাদ্রাসার আধিক্যের দরুন, যাহা গ্রামাঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, লোকদের জ্ঞানে যোগ্যতা এতখানি বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহারা ধর্মীয় পুস্তকাদি সহজে বুঝিতে পারে।

আমার পক্ষ হইতে তবলিগী কার্যক্রম এইভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, আমি পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের অমৃতসর, লাহোর, জলন্ধর, সিয়ালকোট, দিল্লী, লুধিয়ানা ইত্যাদি শহরে বড় বড় সম্মেলনে নিজে গিয়া খোদা তা'লার পয়গাম পৌঁছাইয়া এবং হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য পেশ করিয়াছি। আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ইংরেজিতে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে প্রায় ৭০টি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইসলামী দেশসমূহে প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল পুস্তকের কপির সংখ্যা হইবে প্রায় এক লক্ষ। এই উদ্দেশ্যে আমি কয়েক লক্ষ ইশতেহারও প্রকাশ করিয়াছি। (১) খোদা তা'লার ফযলে ও তাঁহার হেদায়াতে তিন লক্ষের অধিক লোক আমার হাতে আজ পর্যন্ত তাহাদের পাপসমূহ হইতে তওবা করিয়াছে। এইরূপ দ্রুতবেগে এই কার্যক্রম জারী আছে যে, প্রতিমাসে শত শত ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করিয়া আমার জামাতে প্রবেশ করিতেছে। আমার জামাত সম্পর্কে অন্য দেশের লোকেরা অনবহিত নহে। বরং আমেরিকা ও ইউরোপের দূর দূরান্তের দেশগুলিতে পর্যন্ত আমার দাওয়াত পৌঁছিয়া গিয়াছে। এমন কি

এরপর আটের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# "নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ"

**জামার্নীর Frankenthal শহরে ৩০ শে আগস্ট,২০১৬ তারিখে মসজিদ নূরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আঃ)-এর ভাষণ**

**(শেষ ভাগ)**

লর্ড মেয়র উল্লেখ করেছেন যে, এই যে জায়গাটি আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেটি শহরের সম্পত্তি ছিল, আজ এটি আপনাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসারে মসজিদ হল খোদার ঘর। অতএব এটি কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জামাতের সম্পত্তি নয়। বরং যে মসজিদটি এখানে নির্মিত হবে সেটি খোদার ঘর হিসেবে খোদার সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে। এবিষয়ে খোদা তা'লা কুরআন করীমে প্রথম সূরায় ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতিপালক। অতএব আমরা যখন বলি যে, মসজিদ হল খোদার ঘর তখন এর অর্থ হল খোদার সৃষ্টির জন্য এই মসজিদ থেকে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষার প্রসার হওয়া উচিত। এই ঘোষণা উৎকচিত হওয়া উচিত যে, এই ঘরে আগমনকারীরা খোদার ইবাদতকারী যারা প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার করবে যা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটাবে। অতএব খোদার ঘরের এই মর্যাদা আমাদের নিকট অত্যন্ত সম্মানের এবং প্রত্যেক আহমদীর এর উপর অনুশীলন করা উচিত।

অতএব খোদার ঘরে যখন ইবাদতের উদ্দেশ্যে আসেন তখন এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন যে, আপনরা যেমন একদিকে আল্লাহর ইবাদত করবেন, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করবেন, তেমনি অপরদিকে সৃষ্টির প্রতি অধিকারও আদায় করবেন এবং আপনারা আহমদীরা নিজেরাও পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা নিয়ে বসবাস করবেন। প্রতিবেশীদের অধিকার দিবেন এবং তাদের সাথে সখ্যতাপূর্ণ আচরণ করবেন।

কুরআন করীম প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে এত দূর পর্যন্ত বলেছে যে, তোমাদের কাছাকাছি থাকে এমন ব্যক্তিরা, তোমাদের সহকর্মী , তোমাদের সহযাত্রী, তোমাদের অধীনস্ত কর্মীবর্গ - এরা সকলেই তোমাদের প্রতিবেশী। আহমদীদের জন্য বরং একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য প্রতিবেশীর একটি ব্যাপক পরিসর রয়েছে। অতএব প্রতিবেশীদের অধিকার এত ব্যাপক এবং আল্লাহ তা'লা আমাদের নবী হযরত মহম্মদ (সা.) কে এবিষয়ে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, তিনি (সা.) বলেন, আমি মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, প্রতিবেশীদেরকেও উত্তরাধিকারী করে না দেওয়া হয়। প্রতিবেশীদের গুরুত্ব এখানেই স্পষ্ট হয়। এই শহরে আহমদীদের সংখ্যা মাত্র ১৮৪। এই শহরে থেকে ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী গোটা শহরটাই আহমদীদের প্রতিবেশীতে পরিণত হয়েছে। অতএব আমাদের কর্তব্য হল তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আমি আশা রাখি যে, আজকেও আহমদীরা এই কর্তব্য পালন করছে এবং মসজিদ নির্মাণের পর তারা এক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাণীর প্রসার করবে।

লর্ড মেয়র আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই অট্টালিকাটি পাথর দিয়ে নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণের সময় পাথরগুলিকে জোড়া লাগিয়ে একটি বন্ধন তৈরী করে একটি প্রতীক তৈরী হয় যে, আমরা এইভাবে একত্রিত হয়ে থাকব। নিঃসন্দেহে এটি খুবই ভাল জিনিস। কিন্তু আমরা পাথর বা ইঁটের ভবন নির্মাণ করছি। আর এই ইঁটগুলিকে জোড়া লাগাচ্ছি। এই বিষয়টির সাথে একটি বাহ্যিক চিত্র ছাড়াও আরও একটি চিত্র যা আমাদের মনে ফুটে ওঠে তা হল আমরা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার প্রাচীর তৈরী করছি। এবং সেই সমস্ত প্রাচীরগুলিকে জোড়া লাগাচ্ছি যা এতটাই মজবুত হবে যে, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার এই প্রাচীর কখনো ভেঙ্গে পড়বে না বরং প্রাচীরটি উত্তরোত্তর দৃঢ় হতে থাকবে। এবং এর জন্য প্রয়োজন হল সময়ে সময়ে রক্ষাণাবেক্ষণ ও মেরামতি করা। এই কারণেই ইসলাম দীনের বিধি-নিষেধ পালন করার আদেশ প্রদান করে। এবং আদেশ দেয় খোদার অধিকার প্রদান করার, বান্দাদের অধিকার প্রদান করার এবং এই শিক্ষার উপর অনুশীলন করার জন্য নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি করার যাতে এই ভালবাসার বন্ধন কেবল স্থায়ীই নয় বরং দৃঢ় হয়। পাথরের দেওয়ালের দৃঢ়তার একটি সীমা আছে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই সেটি দৃঢ় হতে পারে। এবং সেটি বজায় থাকে। কিন্তু এই প্রাচীর যা ভালবাসা দিয়ে গড়া তা প্রত্যেক মুহূর্তে শক্তিলাভ করে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

তিনি একটি বৃক্ষ উপহার স্বরূপ দিয়েছেন। এই জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। বৃক্ষের শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে যখন এর শিকড়গুলি দৃঢ় হয়। এর অর্থ তিনি এইভাবে করেছেন যে, বৃক্ষের ন্যায় আপনারাও শক্তি লাভ করবেন। আপনাদের এখানে বাস করা একথার প্রমাণ যে, আপনারা এখানে মাটিতে নিজেদের শিকড় বিস্তার করছেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা থেকে আমরা আরও একটি ধারণা এরূপ পাই যে, তোমরা সেই বৃক্ষ হও যার শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছে এবং শাখা-প্রশাখা গগন-চুম্বী। গগন-চুম্বী শাখা-প্রশাখার অর্থ হল তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। আল্লাহ্‌র আদেশ হল তার সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা। অর্থাৎ আমরা যেখানে মাটিতে নিজেদের শিকড় দৃঢ় করছি সেখানে সেই সমস্ত গগন-চুম্বী শাখা-প্রশাখা দ্বারা এখানে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করছি। আমি আশা করি জামাতের সদস্যগণ এই কাজ করতে থাকবে। ইনশাল্লাহ॥

একীভুত হওয়ার প্রশ্ন এসেছিল। একটি সাধারণ অবধারণা তৈরী হয়ে আছে যে, মুসলমানরা একীভুত হয় না। এখানকার শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে অনেক সময় আমাকে অসুবিধায় পড়তে হয়। কেননা, তারা এতটাই একীভুত হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেদের নিয়ে আসা ভাষা বা তাদের পিতা-মাতার ভাষাও ভুলে বসেছে , আর এখন এরা জার্মান ভাষা বলে। যে ব্যক্তি জার্মান ভাষায় কথা বলে এবং নিজের অভিব্যক্তি জার্মান ভাষাতেই ব্যক্ত করছে যা এখানকার স্থানীয় ভাষা, তবে বলতেই হয় যে, সে নিজেকে এই পরিবেশের সঙ্গে একীভুত করে ফেলেছে। তবে হ্যাঁ, ধর্মের সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে এবং কুরআন করীমের শিক্ষা হল ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই।

পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষার মানুষ আছে। আল্লাহ্‌র ফযলে জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর শত শত দেশে ছড়িয়ে আছে যেখানে বিভিন্ন মানুষ নিজের নিজের ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তারা নিজেদের দেশের সঙ্গেও বিশ্বস্ত এবং সেদেশের সঙ্গে একীভুত হয়ে আছে। এর পাশাপাশি নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাও অনুশীলন করছে। কুর্‌আন করীম কোথাও একথা বলে না যে, তোমরা নিজেদের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর, বরং আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের নিজেদের সাথে ভালবাসা তোমাদের ঈমানে অঙ্গ। অতএব দেশের সঙ্গে ভালবাসা যখন ঈমানে অঙ্গ হয় প্রকৃত ধর্মের মান্যকারী একজন প্রকত মুসলমান কীভাবে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? অবশ্যই সে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হবে যে নিজের দেশকে ভালবাসে এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। দেশের অগ্রগতির জন্য নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই আমাদের মাঝে যেন সৃষ্টি হয় সেজন্য আমরা আহমদী সদস্যদেরকে সচেতন করতে থাকি। দেশের প্রতি ভালবাসা যেন এমন পর্যায়ের হয় যা দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। যেন পৃথিবীবাসীর চোখে পড়ে যে, আহমদীরা সব থেকে বেশি আইনমান্যকারী, দেশের অগ্রগতিতে সবথেকে বেশি অংশগ্রহণকারী, সবথেকে বেশি শান্তি ও ভালবাসার বাণীর প্রসারকারী। এবং বিশ্ববাসী যেন দেখে যে, এই কাজে আহমদীরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। অতএব এটিই হল ইসলামী শিক্ষা এবং জামাত আহমদীয়ার উদ্দেশ্য যার অধীনে আমাদের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবং মসজিদ নির্মাণের পর ভালবাসা ও সম্প্রীতির বাণী আরও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। আমি আশা রাখি, আহমদীরা এই মসজিদ নির্মাণের পর পূর্বাপেক্ষা অধিক নিজেদের ইবাদতের অধিকার আদায় করবে এবং এই পরিবেশে ইসলামী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিবে। আল্লাহ্‌ তা'লা এদেরকে এর তৌফিক দিন। ধন্যবাদ।

********

# জুমআর খুতবা

**প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক প্রসঙ্গে বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে নিজের জন্য যা চায় নিজ ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যুহদ) এটি এমন এক সোনালী নীতি যা পৃথিবীর সর্বস্তরে, ঘর থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও, প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ভীত রচনা করে। ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটায়, হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।**

---

**আমি বেশ কয়েকবার অন্যদের সামনে যখন এ কথা তুলে ধরি তখন তারা এতে খুবই প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভালো কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের কর্মের মাধ্যমে এ কথার এবং সকল ইসলামী নির্দেশের সৌন্দর্য প্রমাণ করা। নতুবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, খুব ভালো কথা, কিন্তু এটি বল যে, তোমাদের মাঝে কতজন এ কথা মেনে চলে? সুযোগ পেলে স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না এমন কতজন আছে? কোন কথার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায় যখন যিনি সেই কথা বলেন তিনি নিজেও তা মেনে চলেন।**

---

**সুতরাং নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য আমরা যেভাবে ব্যকুল হয়ে যাই অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের একই মানদন্ডে উপনীত হওয়া উচিত। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হলে আমরা যখন চাই যে, আমাদের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হোক এবং আমাদেরকে যেন ভুল-ভ্রান্তি থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়, আমাদেরকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। অনুরূপভাবে অন্য কেউ যখন কোন ভুল করে যার কারণে আমরাও প্রভাবিত হই, এমন ক্ষেত্রে যদি সে নিয়মিত অপরাধী না হয় এবং যদি বারবার ভুল বা অন্যায় না করে, তাহলে তার সাথেও আমাদের সেই ব্যবহারই করা উচিত অর্থাৎ ক্ষমা করা উচিত। অবশ্য যদি কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে জামাত বা জাতিগত স্বার্থের হানি হয় তাহলে এটি তখন আর ব্যক্তিগত অন্যায় থাকে না বরং জাতিগত অপরাধে পর্যবসিত হয়, আর তখন এমন লোকদের সম্পর্কে সিদ্ধান্তও কোন ব্যক্তি নয় বরং প্রতিষ্ঠান করে।**

---

**আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রোধ সংবরণের পর ক্ষমা করার যে শিক্ষা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞাশূন্যভাবে কেবল একথাই বলে দেননি যে, ক্ষমা করতে থাক, বরং ক্ষমা এবং শাস্তির হিকমত উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন।**

---

## মহানবী (সা.)-এর নিজের শত্রুদেরকে মার্জনা করার অতুলনীয় ঘটনার ঈমান-উদ্দীপক বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর ফ্রাঙ্কফার্টে বায়তুস সুবুহ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ শে সেপ্টেম্বর , ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা ( ২৩ তাবুক,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক প্রসঙ্গে বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে নিজের জন্য যা চায় নিজ ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যুহদ) এটি এমন এক সোনালী নীতি যা পৃথিবীর সর্বস্তরে, ঘর থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও, প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ভীত রচনা করে। ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটায়, হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আমি বেশ কয়েকবার অন্যদের সামনে যখন এ কথা তুলে ধরি তখন তারা এতে খুবই প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভালো কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের কর্মের মাধ্যমে এ কথার এবং সকল ইসলামী নির্দেশের সৌন্দর্য প্রমাণ করা। নতুবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, খুব ভালো কথা, কিন্তু এটি বল যে, তোমাদের মাঝে কতজন এ কথা মেনে চলে? সুযোগ পেলে স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না এমন কতজন আছে? কোন কথার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায় যখন যিনি সেই কথা বলেন তিনি নিজেও তা মেনে চলেন। মানুষ তখনই আমাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারবে যখন আমাদের কথা এবং কর্ম এক হবে। মানুষ শুধু কথা শোনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আমাদের ওপর তাদের দৃষ্টিও থাকে। আমি জার্মানী সফরকালে শেষ যে জুমুআ পড়িয়েছি তাতে সম্ভবত বলেছি যে, মসজিদের উদ্বোধনের সময় জার্মানীতে সেই অঞ্চলের জেলা কমিশনার এই আপত্তি করে যে, তোমরা মহিলাদের সাথে মুসাফাহ্ বা করমর্দন না করে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার কর। আমি এর বিস্তারিত উত্তর দেওয়ার পর এক ব্যক্তি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আপনি সঠিক বলেছেন, প্রত্যেকের নিজের নিজের ধর্ম বা সামাজিক ঐতিহ্য এবং রীতি-নীতি মেনে চলার অধিকার আছে। তবে শর্ত হল সেটি মেনে চললে সেই দেশ এবং জনসাধারণের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সেই ব্যক্তি বলে, তোমাদের খলীফা এ কথা বলেছেন ঠিক আছে, কিন্তু এর বাস্তব চিত্র তখন সামনে আসবে যখন আমরা দেখব যে, আহমদী যুবকরাও এটি মেনে চলে কিনা বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এটি মানে কিনা।

অতএব ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা কোন নির্দেশ বা উন্নত নৈতিকতার কথা বলি তখন অ-আহমদীরা বা অ-মুসলিমরা দেখে যে আমাদের কর্ম কিরূপ। কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, মহানবী (সা.) মু'মিনের উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য যে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলো, তোমাদের প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পরিচয় তখন পাওয়া যাবে যখন তোমাদের চারিত্রিক গুণাবলীও উন্নত হবে এবং একে অপরের প্রতি তোমাদের আবেগ অনুভূতির মানও উন্নত হবে। আর সেই মান কি? সেই মান হলো যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যদের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। এটি হওয়া উচিত নয় যে, নিজের অধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের জন্য সরব হবে আর অন্যদের অধিকার প্রদানের সময় নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করবে।

সুতরাং নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য আমরা যেভাবে ব্যকুল হয়ে যাই অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের একই মানদন্ডে উপনীত হওয়া উচিত। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হলে আমরা যখন চাই যে, আমাদের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হোক এবং আমাদেরকে যেন ভুল-ভ্রান্তি থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়, আমাদেরকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। অনুরূপভাবে অন্য কেউ যখন কোন ভুল করে যার কারণে আমরাও প্রভাবিত হই, এমন ক্ষেত্রে যদি সে নিয়মিত অপরাধী না হয় এবং যদি বারবার ভুল বা অন্যায় না করে, তাহলে তার সাথেও আমাদের সেই ব্যবহারই করা উচিত অর্থাৎ ক্ষমা করা উচিত। অবশ্য যদি কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে জামাত বা জাতিগত স্বার্থের হানি হয় তাহলে এটি তখন আর ব্যক্তিগত অন্যায় থাকে না বরং জাতিগত অপরাধে পর্যবসিত হয়, আর তখন এমন লোকদের সম্পর্কে সিদ্ধান্তও কোন ব্যক্তি নয় বরং প্রতিষ্ঠান করে।

যাহোক আমি এ কথা বলছি, সমাজের দৈনন্দিন পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও আমরা যেখানে মনে করি যে, এটি আমার অধিকার, আমরা অন্যদেরও ক্ষেত্রেও সেই অধিকার প্রদান করি কিনা বা অন্যদেরকে সেই অধিকার দেওয়ার

মানসিকতা আমাদের আছে কিনা। আর এই ক্ষেত্রে মৌলিক একক হলো ঘর, বন্ধু-পরিমহল, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। যখন ক্ষুদ্র পরিসরে বা নিজের ক্ষুদ্র গন্ডিতে এই চিন্তাধারা থাকবে তখন সমাজের বৃহত্তর গন্ডিতেও এই চিন্তাধারার বিস্তার ঘটবে, স্বার্থপরতার অবসান হবে, অন্যের অধিকার দেওয়ার কথা বেশি হবে, ক্ষমা করার প্রবণতা বাড়বে এবং শাস্তি দেওয়া বা শাস্তি পাওয়ানোর প্রতি মনোযোগ কম নিবদ্ধ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফেও বাহ্যিক অধিকার এবং চাহিদার ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমার মনমানসিকতা সৃষ্টি করার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ যারা স্বাচ্ছন্দেও খরচ করে এবং অস্বাচ্ছন্দেও খরচ করে, আর ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে মার্জনা করে, আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।

অতএবএখানে প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সেসব বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য খরচ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা অভাবী। মোহসেন বা সৎকর্মশীল তো তারাই যারা অন্যদের কাজে আসে, অন্যের হিত সাধন করে, পুণ্যের বা নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকওয়ার ওপর বিচরণ করে। সুতরাং যারা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যারা অন্যের কল্যাণ সাধন করে, এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে। আর মানুষের মাঝে যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এমন মানুষ আর স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না, নিজ ভাইয়ের অমঙ্গল বা ক্ষতি চায় না। আর এমন মানুষ তখন আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নতি করে এবং সেসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মোহসেন বা সৎকর্মশীলদের আরেকটি লক্ষণ হলো তারা নিজেদের আবেগ অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর এমনভাবে নিজেদের সংবরণ করে বা এমন পরিস্থিতিতেও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন ক্রোধের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আর এমনভাবে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে আর এর প্রমাণ তখন পাওয়া যায় যখন ক্রোধ সংবরণ করার পর অন্যদের ক্ষমা করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। সকল প্রকার ক্রোধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রবণতাকে মন থেকে বের করে দেওয়া কোন সামান্য বিষয় নয়। রাগও হবে না আর প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রবণতাও মন থেকে বেরিয়ে যাবে-এমনটি হওয়া অনেক বড় বিষয়। আর শুধু প্রতিশোধ প্রবণতাকে মন থেকে উৎপাটন করাই নয় বরং যে ভুল করে তার ওপর কিছুটা অনুগ্রহও যেন করা হয়। এটি একটি অনেক বড় বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চান মু'মিনদের ভিতর যেন এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত হাসানের একটি ঘটনা পাওয়া যায় যে, একবার তার এক কৃতদাস কোন ভুল করে যার ফলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ঠ হন আর তিনি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। তখন সেই কৃতদাস আয়াতের এই অংশ পড়েন যে- وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ অর্থাৎ পুণ্যবানরা তো ক্রোধ সংবরণ করে। এটি শুনে হযরত হাসান শাস্তি দেওয়ার জন্য ওঠানো হাত নিচে নামিয়ে নেন। এতে সেই কৃতদাস আরও সাহসী হয়ে উঠে এবং বলে- وَالْعَافِيْنَ অর্থাৎ এমন পুণ্যবানরা মানুষকে ক্ষমাও করে। তখন হযরত হাসান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী বলেন, যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এটি শুনে সেই দাস আরও সাহসী হয়ে উঠে এবং বলে- وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন। তখন তিনি সেই কৃতদাসকে বলেন যে, যাও তোমাকে আমি মুক্ত করলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০ থেকে সংগৃহীত)

অতএব যারা খোদার ভালোবাসা এবং তাকওয়া অবলম্বনের আকাঙ্খী তারা শুধু অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমাই করে না তারা বরং তাদের ওপর অনুগ্রহও করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এক জায়গায় বলেন-

"স্মরণ রেখ যে ব্যক্তি কঠোর আচরণ করে এবং (সামান্য কারণে) ক্ষিপ্ত হয়ে যায় তার মুখ থেকে তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কথা নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে নিজ প্রতিদ্বন্দীর সামনে দ্রুত ক্ষেপে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি অশালীন এবং অনিয়ন্ত্রিত কথা বলে তার বিবেক-বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত করা হয়। (যারা গালি দেয়, যাদের কথার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায় যা তত্ত্বজ্ঞান এবংখোদার পছন্দনীয় কথা হয়ে থাকে।) তিনি বলেন, ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। যে ক্রোধের সামনে পরাস্ত হয় সে স্থূল-বুদ্ধি এবং অজ্ঞ হয়ে থাকে। কোন ক্ষেত্রে তাকে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ অর্ধেক উন্মাদনার সমান। এটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হতে পারে।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬-১২৭)

তিনি আরো বলেন, "স্মরণ রেখ বিবেক-বুদ্ধি এবং ক্রোধের মধ্যে ভয়াবহ শত্রুতা বিদ্যমান। ( বুদ্ধিমান মানুষ অযথা উত্তেজিত হয় না যা ক্রোধের কারণে সৃষ্টি হয়। ) তিনি বলেন, "যখন রাগ হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি ঠিক থাকতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে এক প্রকারের জ্যোতি প্রদান করা হয় যার ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তিতে এক নতুন আলোর সৃষ্টি হয়। অতঃপর সেই আলো থেকে আরও আলোর জন্ম হয়। ক্রোধের অবস্থায় মন-মস্তিষ্ক যেহেতু তমসাচ্ছন্ন থাকে তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮০)

সুতরাং ইসলামী শিক্ষা এই গভীর প্রজ্ঞা দ্বারা সুসজ্জিত যে, ভুল সম্পাদন হয়ে যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত করার সময় মানুষ যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিরোধী হয় তখনও চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত করা উচিত। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় কঠোরতাও প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ইসলামে শাস্তি দেওয়ার শিক্ষাও রয়েছে। কিন্তু এর জন্য কিছু নিয়ম এবং নীতি নির্ধারিত আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেওয়া মানুষকে হিকমত বা প্রজ্ঞা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং ন্যায় বিচার থেকে দূরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, তাই যদি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দাও তাহলে এটি হৃদয়ের কঠোরতা বলেই সাব্যস্ত হবে। আর হৃদয় যদি কঠোর হয়ে যায় তখন আর তত্ত্বজ্ঞান এবং হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা মুখ থেকে নিঃসৃত হয় না বরং মানুষের কান্ডজ্ঞান তখন লোপ পায়। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ কর, মাথা ঠান্ডা রাখ এবং তারপর শাস্তি দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও। কিন্তু এক্ষেত্রেও শর্ত হলো তোমার হাতে যদি শাস্তি প্রদান করার অধিকার থাকে। এমন নয় যে, সবাই শাস্তি প্রদান করার অধিকার পেয়ে গেছে। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। তাই ধৈর্য্যের মান উন্নত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ধৈর্য্যশীলদের চিন্তা-শক্তি এবং বিবেককে আলোকিত করা হয়, তাদের চিন্তাধারা পূর্ণবিকশিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে পথের দিশা দেওয়া হয়। অপ্রীতকর হলেও মু'মিন যে কোন বিষয়ে বিবেকসম্মত সিদ্ধান্ত করে। তড়িঘড়ি তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না বরং ধৈর্য্যের সাথে সবকিছু দেখে শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ইতিবাচক ও নেতিবাচক সবকিছু সামনে রেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়।

এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া চাই, আমি যেভাবে বলেছি যে, শাস্তি দেওয়ার অধিকারও সকলের নেই বা সবাই শাস্তি দিতে পারে না। যে কোন ব্যক্তি এটি বলতে পারে না যে, আমি চিন্তা করেছি আর আমার বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে শাস্তি দেওয়া উচিত তাই আমি শাস্তি দিচ্ছি। বর্তমান যুগে শাস্তি প্রদান করা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজ। নিঃসন্দেহে মানুষ নিজের অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে বা ক্ষমা করার অধিকার রাখে কিন্তু শাস্তি প্রদানের জন্য অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিতে হয় বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের শরণাপন্ন হতে হয়। মানুষ যদি এই কথা সবসময় দৃষ্টিতে রাখে তাহলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে সমস্ত পরস্পরিক ঝগড়া বিবাদ হয় তা হওয়ার কথা নয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলাবাজি করে যে সময় এবং অর্থ নষ্ট হচ্ছে তা নষ্ট হতো না। আদালতে মামলা যাওয়ার পর যদি একটি আদালত কোন অপরাধীকে ক্ষমা করে তাহলে দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। এই জন্য যে, কেন ক্ষমা করা হলো বা কেন লঘু শাস্তি দেওয়া হলো এবং সে তখন সেই বিষয়টি উচ্চ আদালতে নিয়ে যায়। অথচ গুরুতর কোন বিষয়ও নয়, সামান্য বিষয়ে তারা এমনটি করে থাকে। আমাদের বিচার বিভাগেও এমন বিষয়াদি এসে থাকে। কোন কোন আহমদী বলে যে, আমরা জামাতের বিচার বিভাগে সিদ্ধান্ত নিব না। তারা আদালতে চলে যায়। অথচ মামলাবাজির আশ্রয় নেওয়ার মত তেমন বড় কোন বিষয় নয়। আর এ কারণে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রোধ সংবরণের পর ক্ষমা করার যে শিক্ষা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞাশূন্যভাবে কেবল একথাই বলে দেননি যে, ক্ষমা করতে থাক, বরং ক্ষমা এবং শাস্তির হিকমত উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (সূরা আশ্-শূরা: ৪১) وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি যতটা অন্যায় করা হয় সে অনুপাতে হয়ে থাকে। অতএব যে কেউ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্‌র হাতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

অতএব মূল বিষয় হলো অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে সংশোধন করা। প্রতিশোধ নেওয়া বা মামলায় জড়ানো অথবা নিজের ও অপরের সম্পদ ও সময় নষ্ট করা এবং জামাতী প্রতিষ্ঠানের হাতে বিষয়টি থাকলে জামাতের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করা এর আসল উদ্দেশ্য নয়। যদি ক্ষমা করার ফলে সংশোধন হয় তাহলে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি সংশোধনের জন্য শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয় তাহলে প্রজ্ঞার দাবি হলো শাস্তি প্রদান করা। আর এরপর নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিষয় নিয়ে যাওয়া উচিত।

এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে লিখেছেন। এক জায়গায় যেমন, তিরিয়াকুল কুলূবে তিনি বলেন, "ন্যায় বিচারের আইন অনুসারে অপরাধ অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিজের অপরাধীকে এই শর্তের অধীনে ক্ষমা করে যে, সেই ক্ষমার ফলে অপরাধীর সংশোধন হবে, এমন নয় যে, এর ফলে সে অপরাধের ক্ষেত্রে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠবে, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট বড় পুরস্কার পাবে।"

(তারইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৬৩)

পুনরায় বারাহীনে আহমদীয়ায় তিনি বলেন, "পাপের শাস্তি স্বরূপ ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের দাবি হলো অপরাধী ততটাই শাস্তিযোগ্য যতটা সে অপরাধ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধন করে অর্থাৎ এমন মার্জনা যদি না হয় যার ফলাফল অপ্রীতকর হতে পারে তাহলে এমন মার্জনাকারী আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাবে।"(বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩-৪৩৪-এর উপটীকা) অর্থাৎ ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে এটি অনেক ভালো কথা। আর এর ব্যাখ্যা হলো, এই ক্ষমার ফলে যেন কোন প্রকার ধৃষ্টতা সৃষ্টি না হয়। এই ক্ষমার ফলে যদি কোন অপ্রীতকর বিষয় সামনে না আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, এরূপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার কাছে। তিনি যতটা চান তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন।

অতএব মার্জনা এবং ক্ষমা তখন করতে হয় যখন অপরাধীর আচরণ স্পষ্ট হয় অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে সে আর এই অন্যায় কাজ করবে না। অনেকেই নিয়মিত অপরাধী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেকবার অপরাধ করে সে ক্ষমা চায়। এমন লোকদের জন্য শাস্তি আবশ্যক। আর শাস্তিও এমন হওয়া উচিত যার ফলে সংশোধনের দিকটা সামনে আসে।

আরেক জায়গায় তিনি বলেন- " অন্যায়ের শাস্তি ততটা হওয়া উচিত যতটা অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি মার্জনা করে, আর সেই ক্ষমার ফলে যদি সংশোধন হয় তাহলে আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে পুরস্কৃত করবেন। অতএব কুরআন অনুসারে সব জায়গায় প্রতিশোধ নেওয়াও প্রশংসনীয় বিষয় নয় আর সর্বত্র মার্জনা করাও প্রশংসনীয় নয়। বরং স্থান-কালভেদে এটি নির্ধারণ করা উচিত। (অর্থাৎ শাস্তি বা মার্জনা- কিসে কল্যাণ নিহিত সেটি বিবেচনা করা উচিত) আর শাস্তি এবং মার্জনা স্থানকালভেদে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত, অযৌক্তিক হওয়া উচিত নয়। এটিই কুরআনের শিক্ষার মূল অর্থ। "

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩০)

কোন নীতিমালা বা আচরণবিধি ছাড়াই ক্ষমা করে দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া বা অযথা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত নয়। এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট গন্ডী নির্ধারিত আছে। সেই গন্ডিতে থাকা উচিত। আর দেখতে হবে যে, কল্যাণ কোথায়, উপকারিতা কোথায়। অতএব এই হলো ইসলামী শাস্তি এবং ক্ষমার প্রজ্ঞা বা হিকমত যে, সংশোধন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আজকাল যেসমস্ত জাগতিক আইন রয়েছে সেখানে আমরা দেখি যে, আদালতের দন্ড-বিধীতে সকল অপরাধেরই শাস্তি দেওয়া হয় আর মানুষকে কারাগারে এজন্য বন্ধ করে রাখা হয় যেন সংশোধন হয়। কিন্তু এই সমস্ত উন্নত বিশ্বের বিশ্লেষকরাও এখন লেখা আরম্ভ করেছে যে, কারাগার থেকে শাস্তি ভোগ করার পর যেসমস্ত অপরাধী বাইরে আসে অপরাধে তারা আরও আরো অধঃপতিত হয়। কেননা শাস্তি দাতারাও এবং অপরাধী উভয়েই শুধু আইনই মেনে চলে, খোদার ভয় তাদের মাঝে নেই।। যাহোক মু'মিনদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা হল এটিই যে, তাদের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করার অভ্যাস থাকা উচিত। আর অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর পরিস্থিতি ও পূর্বের আচরণ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। চোখ বন্ধ করে সবাইকে ক্ষমা করা হোক, এটিও আল্লাহ্ তা'লা চান না। আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেওয়ার মানসিকতাও সবসময় প্রকাশ করা হোক এটিও আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। ক্ষমা করতে থাকলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর চোখ বন্ধ করে শাস্তি দিতে থাকলেও হিংসা এবং বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সমাজে ঘৃণার প্রাচীর গড়ে উঠতে থাকে এবং অশান্তির বিস্তার ঘটতে থাকে।

আমরা যদি আমাদের পরিবেশকে বিশ্লেষণ করি। পরিবেশের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিই তাহলে দেখা যাবে এমন মানুষ যাদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করা হয়, অপরাধ করা হয় তারা কঠোরভাবে এই দাবি করে যে, অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে যেন অন্যদের জন্য এই শাস্তি শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে আর কেউ যেন কোন প্রকার অপরাধ করার দুঃসাহস না দেখায়। আর অপরাধী দাবি করে যে, ক্ষমা করা উচিত। আজকে মানবাধিকারের নামে অনেক সংগঠন পৃথিবীতে দেখা যায়। যেখানে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ভালো কাজও করছে সেখানে ক্ষমা করানোর ক্ষেত্রেও অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করে সকল অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাতে চায়। অনুরূপভাবে যেসব অপরাধী ধর্ম এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার কিছুটা বোধ-বুদ্ধি রাখে তারা বলে- আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা কর। তাই ক্ষমাই করা উচিত। কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজেও বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। তাই তোমরাও বান্দাদের অধিকার প্রদান করতে গিয়ে ক্ষমা কর। ব্যক্তিগত পর্যায়েও সবাই যেন নিজের অপরাধীদের ক্ষমা করে আর জামাতীভাবেও যেন সবাইকে ক্ষমা করা হয়। যেন বান্দাদের অধিকার প্রদান হয়। তাতে জামাতের ক্ষতি হচ্ছে না উপকার হচ্ছে তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই। যারা এইভাবে বড় বড় কথা বলে, উভয় পক্ষ থেকে, হয়তো তারা অপরাধে অভ্যস্ত বা তারা ন্যায়-নীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নিতে চায়। একদিকে অপরাধ করে, অপরদিকে অপরাধের শাস্তি এড়ানোর জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশের উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যায় কথা বলে। এরা আসলে স্বার্থপর। এমন লোকদের বিরুদ্ধে যদি কেউ অপরাধ করে, তাহলে এরা কখনো ক্ষমা করে না। বরং অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বৈধ-অবৈধ সকল প্রকারের চেষ্টা করে। এখানে এসে তাদের নীতি বদলে যায়। তখন তারা খোদার এই নির্দেশকে ভুলে যায় যে, নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত। অনুরূপভাবে যারা ক্ষমা করতে চায় না বরং চায় যে তার অপরাধী যেন অবশ্যই শাস্তি পায়, তারাও নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থিত হলে ক্ষমা চাইবে এবং বলবে যে, ক্ষমা করাই আসলে প্রশংসনীয়। এমন স্বার্থপরদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে এবং পরম ন্যায়-নীতি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত দেয় যে, যদি তুমি এটি নিশ্চিত হও যে, ক্ষমা করলে সংশোধন হবে তাহলে ক্ষমা করাই উত্তম। কিন্তু যদি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শাস্তি দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। যাহোক এটি তো ইসলামের একটি নীতিগত শিক্ষা।

এখন আমরা দেখি যে, মহানবী (সা.) কতটা ক্ষমা করতেন আর সাহাবীদের এ সম্পর্কে কি শিক্ষা তিনি দিয়েছেন। হযরত ইমাম হাসানের দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছিলাম যে, তিনি তার এক ভৃত্যের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু সেটি সামান্য এক অপরাধ ছিল। ক্ষমার পরম মার্গ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই। যাদের শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল তিনি (সা.) তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। অন্য কারো বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে তাকে ক্ষমা করেননি বরং তাঁর নিজের অপরাধীদের এবং তার সন্তানদের হত্যাকারীদের তিনি ক্ষমা করেছেন। কেননা তাদের সংশোধন হয়ে গিয়েছিল।

হাদীসের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, হাব্বার বিন আসওয়াদ নামে এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা.)-এর দৌহিতা হযরত যায়নাব এর ওপর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে বর্শার আক্রমন হানে। তিনি তখন অন্তঃসত্তা ছিলেন। আক্রমনের কারণে তার গর্ভপাত হয়, তিনি আহত হন পান আর এর ফলে তিনি ইন্তেকালও করেন। এই অপরাধের কারণে হাব্বারের বিরুদ্ধে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই ব্যক্তি কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মদীনা ফিরে আসেন তখন হাব্বার মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আমি করুণা ভিক্ষা চাচ্ছি। প্রথমে আপনার ভয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার মার্জনা এবং দয়া আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা অজ্ঞ ছিলাম, আমরা ছিলাম মুশরিক। খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আমার সীমালঙ্ঘন স্বীকার করছি সুতরাং আমার অজ্ঞতাকে আপনি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখুন। আমাকে ক্ষমা করুন। অতএব মহানবী (সা.) তার কন্যার এই হত্যাকারীকে ক্ষমা করেন। এবং বলেন যে, যাও! হে হাব্বার! আমি তোকে ক্ষমা করলাম। এরপর বলেন যে, খোদার এটি অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। অতএব তিনি যখন দেখেছেন যে, সংশোধন হয়ে গেছে তখন তিনি নিজের কন্যার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেন।

(তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূলে করীম (সা.) তাঁর উপর হওয়া কোন অত্যাচারের কখনো প্রতিশোধ নেননি।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

এই কারণেই তিনি সেই ইহুদী মহিলাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যে তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। অথচ কোন কোন সাহাবীর ওপর সেই বিষের প্রভাবও পড়েছিল। (সীরাত ইবনে হিশশাম)।

এছাড়া উহুদের যুদ্ধে যে হিন্দা মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযার অঙ্গচ্ছেদ করেছিল, তাঁর কান, নাক এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল এবং কলিজা বের করে চিবিয়েছিল; মক্কা বিজয়ের সময় অন্যান্য মহিলাদের সাথে মিশে সে বয়আত করে নেয়। তার কোন কোন প্রশ্ন শুনে মহানবী (সা.) তাকে চিনে ফেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা? সে বলে যে, হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এখন আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছি। পূর্বে যা ঘটে গেছে তা মার্জনা করুন। মহানবী (সা.) হিন্দাকে ক্ষমা করেন। হিন্দার ওপর তার মার্জনার এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, তার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা তার হৃদয়ে ঘর করে। বরং সেদিন সন্ধ্যাতেই সে মহানবী (সা.)কে দাওয়াত করে এবং খাওয়ার জন্য দু'টি ছাগল ঝলসে পাঠিয়ে দেয় এবং একই সাথে এটিও বলে পাঠায় যে, আজকাল পশুর অভাব রয়েছে তাই শুধু দু'টোই পাঠালাম। এই তুচ্ছ তোহফাটুকু গ্রহণ করুন। এতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হিন্দার পশুপালে অনেক বরকতদাও। কথিত আছে যে, এই দোয়ার ফলে এমন বরকত সৃষ্টি হয় যে, সেই পশুপাল নিয়ন্ত্রণ করা তার জন্য সম্ভব হতো না।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭-১৩৯)

মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কে সকলেই অবগত আছে। তার সমস্ত ধৃষ্টতা ও বেয়াদপি সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাকে ক্ষমা করেন। শুধু তাই নয় তিনি (সা.) তার জানাযাও পড়ান। যদিও হযরত উমর (রা.) বারবার বলছিলেন যে, তার জানাযা পড়াবেন না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

কাব বিন যুহায়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিল। কোন অপরাধের কারণে তার জন্যও শাস্তির সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। মক্কা বিজয়ের পর তার লিখিত সংবাদ জানায় যে, এখন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা চাও। অতএব সে মদিনা আসে এবং তার এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে আশ্রয় নেয় আর মহানবী (সা.)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ে। নামাযের পর রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কাব বিন যুহায়ের তওবার জন্য এসেছে আর আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে । তিনি (সা.) তার চেহারা চিনতেন না। তাই সে ব্যক্তি বলল যে, যদি অনুমতি হয় তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি (সা.) বললেন যে, হ্যাঁ তাকে সামনে নিয়ে আসা হোক। সেই ব্যক্তি তখন বলল যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল আমিই কাব বিন যুহায়ের। তার সম্পর্কে যেহেতু হত্যার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল সেই কারণে একজন আনসারী তাকে হত্যার জন্য দন্ডায়মান হয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, এ ক্ষমার আবেদন নিয়ে এসেছে একে ক্ষমা কর। তখন রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে সেই ব্যক্তি একটি 'কাসীদা' (কবিতা) পরিবেশন করল। মহানবী (সা.) তা শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাকে চাদর পরিয়ে দিলেন।

(তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড)

এই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.) ক্ষমার মান। তিনি (সা.) কেবল ক্ষমাই করতেন না বরং পুরস্কৃত করে, দোয়া দিয়ে বিদায় দিতেন। মহানবী (সা.)-এর মার্জনার অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে আর তাঁর ক্ষমা এমন পরম উন্নত মানের যে, তা দেখে মানুষ হতভম্ব হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের অনেক অনেক গালি দেওয়া হয়েছে। অতিশয় যাতনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের জন্য নির্দেশ ছিল 'আ'রেয আনিল জাহিলিন।' স্বয়ং সেই পূর্ণ মানব, আমাদের নবী (সা.)-কে বড় অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাঁকে গালি দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নোংরা ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নৈতিক চরিত্রের সেই মূর্তিমান ধারক এবং বাহক এর মোকাবেলায় কি করলেন! তাদের জন্য দোয়া করেছেন। আর আল্লাহ্‌র যেহেতু প্রতিশ্রুতি ছিল যে, অজ্ঞদেরকে যদি এড়িয়ে চল তাহলে তোমার সম্মান এবং প্রাণকে আমরা নিরাপদ রাখব আর এই নিকৃষ্টরা একে কোনভাবে কলুষিত করতে পারবে না। অতএব এমনটিই হয়েছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩)

রসূলে করীম (সা.)-এর বিরোধীরা তার সম্মান ও মর্যাদাকে কলুষিত করতে পারেনি বরং নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে তার চরণে লুটিয়ে পড়েছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে। রসূলে করীম (সা.) নিজ সাহাবীদের ক্ষমার কোন মান অর্জনের নসীহত করেছেন সে সম্পর্কে হাদীসে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। দু'একটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল আমার এক কৃতদাস রয়েছে যে অন্যায় কাজ করে। আমি কি তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারি? রসূলে করীম (সা.) বলেন, তুমি তাকে প্রতিদিন ৭০বার ক্ষমা কর। (মাজমায়েয যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৯) অর্থাৎ অগণিত বার তাকে ক্ষমা কর। অতএব মহানবী (সা.) দাস এবং অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহারের এই উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখানে এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে আজকাল দাস প্রথা নেই আর এক মু'মিন চাকরিজীবির কাছেও এটি প্রত্যাশা করা হয় যে, সেও তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করবে। যেহেতু ক্ষমার নির্দেশ রয়েছে তাই প্রতিটি কাজই ভুল করব এটিও অন্যায় আচরণ। যেভাবে অন্যান্য স্থানে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, যার ওপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে সেই দায়িত্বও পুরোপুরি পালন করা উচিত। সুতরাং এই নির্দেশ উভয় পক্ষের জন্যই। যেখানে মালিকের জন্য নির্দেশ হলো ছোট ছোট বিষয়ে ক্ষুণ্ন না হওয়া এবং মার্জনা করা সেখানে অধিনস্ত বা যারা চাকরিজীবি তাদের জন্যও নির্দেশ হলো তাদের নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বও পুরোপুরি পালন করা। ক্ষমা এবং মার্জনা সম্পর্কে আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"এই জামাতটিকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য হল, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ এবং প্রত্যেকটি অঙ্গে যেন তাকওয়া সঞ্চারিত হয়। বাহ্য ও অভ্যন্তর যেন তাকওয়ার জ্যোতিতে আলোকিত হয়। যেন উত্তম চরিত্রের নমুনা প্রদর্শিত হয় এবং অকারণ ক্রোধ কোনক্রমেই না থাকে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, জামাতের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ক্রোধের দোষটি এখনও বিদ্যমান। সামান্য কথাতেই বিদ্বেষ ও ঘৃণা তৈরী হয়ে যায় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এমন মানুষেরা জামাতের কোন অংশ পাবে না। যদি কেউ গালি দেয় তবে অপরজন নীরব থাকতে যে অসুবিধা কোথায় তা আমার বোধগম্যের অতীত। প্রত্যেক জামাতের সংশোধন সর্বপ্রথম আচরণের মাধ্যমে আরম্ভ হয়ে থাকে। প্রারম্ভে ধৈর্য্যসহকারে তরবীয়ত অব্যাহত রাখা উচিত এবং সর্বোত্তম পরিকল্পনা হল, যদি নোঙরা ভাষা প্রয়োগ করে তবে তার জন্য ব্যথিত চিত্তে এই দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ! এর সংশোধন কর। কক্ষনো মনের মধ্যে বিদ্বেষ পালন করবে না। যেরূপ এই জগতের কিছু নিয়ম-কানুন আছে অনুরূপে খোদারও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যখন এই পৃথিবী নিজের নিয়ম-কানুনকে ত্যাগ করে না তবে খোদা তা'লা কিভাবে নিজের নিয়ম-কানুন ত্যাগ করতে পারেন। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে তোমরা কোন মূল্য রাখ না। পাশবিকতা দয়া, ধৈর্য্য এবং ক্ষমাপরায়ণতার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণাবলীর স্থান দখল করুক খোদা তা'লা এমনটি কখনো চান না। যদি তোমরা এই সকল উত্তম গুণাবলীর ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন কর তবে অচিরেই তোমরা খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু আমার আক্ষেপ হয় যে, জামাতের একটি অংশ এখনও পর্যন্ত এই সকল আচরণের ক্ষেত্রে দুর্বল। এর ফলে শত্রুরাই যে কেবল আনন্দিত হবে তাই নয়, বরং এমন সকল ব্যক্তি নিজেরাও নৈকট্যের স্থান থেকে অধঃপতিত হয়।

এটি সত্য যে, সকল মানুষ একই প্রকৃতির নয়। এই কারণেই কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে- كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ

[অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে-অনুবাদক (বনী ইসরাঈল: ৮৫)]

কিছু মানুষ যদি এক প্রকারের আচরণে উত্তম হয় তবে সে অন্য ক্ষেত্রে দুর্বল। যদি এক প্রকার আচরণে সে ভাল হয় তবে অন্যটি মন্দ। কিন্তু তথাপি এটি আবশ্যিক নয় যে, তার সংশোধন অসম্ভব।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৭-১২৮)

আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করেছেন। অনেকের কোন কোন গুণাবলী খুবই উন্নত এবং মহান কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তার ভিতর কিছু দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, তার সংশোধনই অসম্ভব এবং সব উন্নত গুণাবলী অবলম্বন করা উচিত নয়।

মানুষের প্রকৃতি এবং অভ্যাস নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্ন, যাদের মাঝে দুর্বলতা দেখা যায় তাদের মাঝে কিছু ভালো গুণও আছে। এটি নয় যে, কোন ব্যক্তির মাঝে আপাদমস্তক শুধু দোষই রয়েছে, কোন গুণই নেই। ভালো গুণও রয়েছে আর দুর্বলতাও রয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে এটি চান যে, খোদার নির্দেশের অনুসরণে আমাদের নিজেদের সংশোধনের দিকে

# মহান আল্লাহ্ঃ সমস্ত ধর্মমতের মূল বিষয়

(শেষ ভাগ)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ইসলামী নীতি দর্শন'-এর এক স্থালে আল্লাহ্র পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

"অতঃপর ইহাও জানা আবশ্যক যে, যে খোদার দিকে আমাদিগকে কুরআন শরীফ আহ্বান করে, তাঁহার নিম্নরূপ গুণাবলী লিখিত আছেঃ

"সেই খোদা এক-অদ্বিতীয় ও অয়শীবিহীন , তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য ও আনুগত্যের যোগ্য নহে।" (৫৯:২৩)। ইহা এই জন্যই বলিয়াছেন যে, তিনি অংশীবিহীন না হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার শক্তির উপর শত্রুর শক্তি প্রবল হইতে পারিত। এই অবস্থায় ঐশী মর্যাদা বিপন্ন হইত এবং তিনি বলিয়াছেনঃ তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য নাই।" ইহার অর্থ, তিনি এমন কামেল খোদা যাহার গুণাবলী কামালত এরূপ উচ্চ ও মহান যে, বিশ্ব চরাচরে কামেল গুণাবলী জন্য কোন খোদার নির্বাচন করিতে চাহিলে, কিংবা মনে মনে শ্রেয় হইতে শ্রেয়তর এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কোন খোদার গুণাবলী কল্পনা করিতে চাইলে, যাঁহাকে ছাড়াইয়া কেহ উত্তম হইতে পারে না, তিনিই আল্লাহ বা খোদা হন, যাঁহার আরাধনায় তুচ্ছ বস্তুকে শরীক করা অন্যায়। অতঃপর তিনি বলিয়াছেনঃ "তিনি আলেমুল গায়েব"। অর্থাৎ তাঁহার সত্তাকে একমাত্র তিনিই জানে। তাঁহার সত্তাকে কেহ পরিবেষ্টন করিতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর আপাদমস্তক আমরা দর্শন করিতে পারি, কিন্তু খোদার আপাদ মস্তক দর্শনে আমরা অক্ষম। পুনরায় তিনি বলিয়াছেনঃ " তিনি আলেমুশ শাহাদাহ"। অর্থাৎ কোন জিনিষ তাঁহার দৃষ্টির অগোচর নহে। ইহা হইতে পারে না যে, তিনি খোদা বলিয়া অভিহিত হইয়া বস্তু জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি বিশ্বের অণুপরমাণু পর্যন্ত দেখেন। কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তিনি জানেন, কখন তিনি এই জগৎ-বিধানকে ভঙ্গিয়া ফেলিবেন এবং কেয়ামত আনিবেন এবং পুনরুত্থান ঘটাইবেন। তিনি ছাড়া কেহ জানে না যে, এরূপ কখন হইবে। সুতরাং, তিনিই খোদা যিনি সকল প্রকারের সময়কেই জানেন। তিনি আবার বলিয়াছেনঃ "হুওয়ার রহমান"। অর্থাৎ তিনি প্রাণী সকলের অস্তিত্ব ও উহাদের কর্মের পূর্বে শুধু আপন দয়ায়, কোন স্বার্থের জন্য নহে বা কাহারও কর্ম ফলেও নহে, তাহাদের জন্য আরামের সামগ্রী যোগাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য ও পৃথিবী এবং অন্য সব জিনিস আমাদের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে ও আমাদের কার্য সাধনের পূর্বে, আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দানের নাম খোদা নিজ গ্রন্থে রহমানিয়ত এবং এই কাজের দিক হইতে নিজের নাম রহমান রাখিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন "আর রহীম" তিনি খোদা, যিনি উত্তম কাজের সর্বোত্তম পুরস্কার দেন। কাহারও শ্রমকে বিনষ্ট করেন না। এই কাজের দিক হইতে তিনি রহীম এবং এই গুণের নাম রহীময়্যত। তারপর তিনি বলিয়াছেনঃ "মালেকে ইয়াওমিদদীন"। অর্থাৎ সেই খোদা প্রত্যেকের পুরস্কার বা শাস্তি স্বহস্তে ধারণ করেন। তাঁহার এমন কার্য নির্বাহক নাই, যাহাকে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা সঁপিয়া দিয়া নিজে পৃতক হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিজে কিছুই করেন না। এমনও নহে যে, সেই কার্য নির্বাহকই যত পুরস্কার ও শাস্তি দেয় বা ভবিষ্যতে দিবে। তার পর তিনি বলিয়াছেনঃ

"আল মালেকুল কুদ্দুস"। অর্থাৎ সেই খোদা বাদশাহ, যাঁহার কোনই কলঙ্ক নাই"। (৫৯ঃ২৪)

ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুসের বাদশাহাত কলঙ্কহীন নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি কোন বাদশাহের সব প্রজা কষ্ট পাইয়া বা বিতাড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশ অভিমুখে পলায়ন করে, তবে তাহার বাদশাহী কায়েম থাকিতে পারে না। কিংবা যদি সব প্রজা দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কোথা হইতে আসিবে? যদি প্রজাগণ বাদশাহের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দেয় যে, তাঁহার ও প্রজাদের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্টপূর্ণ পার্থক্য আছে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের নিকট নিজের কি বিশেষ যোগ্যতা সাব্যস্ত করিবেন? বস্তুতঃ খোদা তা'লার বাদশাহী এ প্রকারের নহে। তিনি মুহূর্তে সব দেশ লয় করিয়া অন্য সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন। যদি তিনি এইরূপ ক্ষমতাবান স্রষ্টা ও শক্তিমান প্রতিপালক না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাদশাহত নির্যাতন ছাড়া চলিতে পারিত না। কারণ, তিনি একবার বিশ্ববাসীকে ক্ষমা এবং মুক্তিদান করিয়া অন্য জগৎ কোথা হইতে আনিতেন? মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রেরণের জন্য আবার ধর পাকড় ও নির্যাতনের পথে কি প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তিকে প্রত্যাহার করিতে হইত না? তদবস্থায়, তাঁহার ঐশী কর্মকান্ডে পার্থক্য ঘটিত এবং তিনি পৃথিবীর বাদশাহগণের ন্যায় এক কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত বাদশাহ হইয়া পড়িতেন, যাহারা দেশের জন্য আইন-কানুন তৈরী করে, যাহারা কথায় কথায় বিগড়াইয়া যায় এবং নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন দেখিতে পায় যে, নির্যাতন ছাড়া গতি নাই, তখন তাহারা নির্যাতনকে মাতৃ-স্তন্যের দুধের ন্যায় মনে করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজকীয় আইনে একটি জাহাজকে বাঁচাইতে একটি নৌকার সকল আরোহীকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করাকে এবং সত্য সত্যই বিনষ্ট করাকে, সিদ্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু খোদার পক্ষে এই প্রকার অসহায় হওয়া অনুচিত। সুতরাং যদি খোদা সর্বশক্তিমান ও অনস্তি-ত্ব হইতে সৃষ্টিকারী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি হয় দুর্বল রাজাদের ন্যায় মহিমার পরিবর্তে অত্যাচারের দ্বারা কাজ লইতেন, অথবা বিচারক হইয়া খোদায়ীকেই বিদায় দিতেন। পরন্তু খোদার জাহার সকল মহিমার সহিত প্রকৃত বিচারের উপর চলিতেছে। তিনি আবার বলিয়াছেন, 'আসসালাম' অর্থাৎ সেই খোদা, যিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিপদ-আপদ ও কঠোরতা হইতে নিরাপদ, বরং শান্তি দাতা। ইহার অর্থও স্পষ্ট। কারণ যদি তিনি নিজেই বিপদগ্রস্থ হইতেন, লোকের হাতে মারা পড়িতেন এবং তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে এই মন্দ নমুনাকে দেখিয়া মন কি প্রকারে এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিত যে, এহেন খোদ আমাদিগকে নিশ্চয় আপদ মুক্ত করিবেন? আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা উপাস্যদের সম্বন্ধে বলেনঃ

"যেসব মানুসকে তোমরা খোদা বানাইয়া বসিয়া আছ, তাহারা সকলে মিলিয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতে চাহিলেও, কখনও তাহা পারিবে না, এমনকি একে অপরকে সাহায্য করিলেও না। বরং যদি মাছি তাহাদের কোন জিনিষ ছিনাইয়া লইয়া যায়, তবে সেই মাছি হইতে সেই বস্তু ফেরৎ আনিবার শক্তিও তাহাদের হইবে না"। (২২ঃ ৭৪-৭৫)

তাহাদের উপাসকগণ বুদ্ধি ও শক্তিতে দুর্বল। খোদা তো তিনি, যিনি সকল শক্তিমান হইতেও অধিক শক্তিশালী এবং সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। কেহ তাঁহাকে ধরিতে বা বধ করিতে পারে না। যাহারা ভ্রমে নিপতিত, তাহার খোদার মর্যাদা বুঝে না এবং জানে না যে, খোদা কেমন হওয়া উচিত। অতঃপর বলিয়াছেনঃ

" খোদা শান্তি দাতা, স্বীয় কামালাত তৌহীদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকারী"।

ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, প্রকৃত খোদার মান্যকারী ব্যক্তি কোন মজলিসে লজ্জিত হইতে পারে না এবং সে খোদার সম্মুখেও লজ্জিত হইবে না। কারণ তাহার কাছে শক্তিশালী যুক্তি থাকে। কিন্তু কৃত্রিম খোদায় বিশ্বাসী বড়ই বিপদে থাকে। সে যুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে নিরর্থক আজেবাজে কথাকে গোপন তত্ত্ব আখ্যা দেয়, যাহাতে হাস্যস্পদ হইতে না হয় এবং প্রমাণিত ভ্রান্তিসমূহকে ঢাকা দিতে চাহে। তিনি আরও বলিয়াছেনঃ

"তিনি সকলের রক্ষক, পরাক্রমশালী, নষ্ট হওয়া কাজকেও সুসম্পন্নকারী; তাঁহার সত্তা চূড়ান্তভাবে অভাবের ব্যতীত" (৫৯: ২৪)

তিনি আরও বলেনঃ

" তিনি এমন খোদা যে, তিনি সকল দেহেরও স্রষ্টা এবং সকল আত্মার স্রষ্টা; গর্ভাশয়ে রূপশিল্পী তিনিই। যত ভাল নাম ধারণ করা সম্ভব, সব তাঁহারই"। (৫৯: ২৫)

তিনি আবার বলেনঃ

" সদা বিদ্যমান, সকল প্রানের প্রাণ এবং সব অস্তিত্বের আশ্রয়" (২: ২৫৬)

ইহা বলার কারণ, তিনি অনাদি ও অনন্ত না হইলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা রহিত যে, আমাদের পূর্বেই না তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায়। তারপর বলেনঃ

" সেই খোদা এক-অদ্বিতীয় খোদা। তিনি কাহারও পুত্র নহেন, এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে এবং কেহ তাঁহার স্বজাতীয় নহে।" (১১২: ২-৫)

প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতায় মহান আল্লাহ্র পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

".....ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানের মূখ্য উদ্দেশ্য হল, 'ইসলাম শব্দে নিহিত প্রকৃত মর্মার্থ যেন বাস্তবায়িত হয়। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য খোদার ভালবাসা জাগ্রত করতে কুরআনের বিবিধ শিক্ষা সচেষ্ট। কখেনো এটি খোদার সৌন্দয্য বর্ণনা করে, আবার কখনো তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করায়। কেননা, অন্তরে কারও ভালবাসা হয় তার সৌন্দর্যের কারনে জন্ম নেয় কিংবা তার অনুগ্রহের দরুণ সৃষ্টি হয়। তদনুযায়ী, খোদাকে নিজ গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁর মাঝে কোন খুঁত

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

**Vol. 1 Thursday, 27 th Oct, 2016 Issue No. 34**

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
**SUBSCRIPTION**
ANNUAL : Rs. 300/-

নেই। তিনি পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি আর পবিত্র শক্তিসমূহের আধার। তিনি সমস্ত সৃষ্টির ভিত্তি এবং যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তিনি সর্বপ্রকার পুরস্কার ও শাস্তি-প্রদানের মালিক এবং যাবতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি দূরত্ব সত্বেও সন্নিকটে বিদ্যমান এবং নৈকট্য সত্বেও তিনি দূরে অবস্থিত। তিনি সবচেয়ে গোপনীয় কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশি প্রকাশ্য অন্য কেহ আছে একথা বলা যাবে না। তিনি নিজ সত্তায় জীবিত আর প্রত্যেক সত্তা তাঁর কারণে জীবন্ত। তিনি নিজ সত্তায় অনাদি এবং প্রতিটি জিনিষ তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাবতীয় জিনিষের বাহক কিন্তু তিনি কারও দ্বারা বহনকৃত নন। এমন কিছুই নেই যা তাঁকে ছাড়াই নিজে সৃষ্ট কিংবা তাঁর সাহায্য ছাড়া নিজেই বেঁচে থাকতে পারে। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর জ্যোতি এবং প্রত্যেকটি তাঁর দ্বারা আলোকিত এবং তাঁরই সত্তার প্রতিবিম্ব। তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। এমন কোন আত্মা নেই যা তাঁর দ্বারা পালিত না হয়ে নিজ সত্তায় বর্তমান। আত্মার যাবতীয় ক্ষমতা নিজ থেকে সৃষ্ট নয় বরং তাঁরই প্রদত্ত।" (ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত)

এই সুমহান বিশাল অস্তিত্ব আমাদের সবার আশ্রয়। আমাদের উৎস তিনি, আমাদের জীবন, আমাদের চৈতন্য, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রীয় ও শক্তি সব তাঁরই দান। এগুলোকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে লাগানোর যথাসাধ্য চেষ্টার নাম ইবাদত বা উপাসনা। সবশেষে আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। তিনিই আমাদের হিসেব নিকেশ ও বিচার করবেন। আমরা তাঁর কাছে দয়া, ক্ষমা ও মার্জনা প্রত্যাশা করি।

(সমাপ্ত)

*একের পাতার পর.....*

আমেরিকায় কয়েক ব্যক্তি আমার জামাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা নিজেরাই আমার নিদর্শনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য অসাধারণ ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে ছাপিয়া দিয়াছে। ইউরোপের দেশগুলিতেও আমার জামাতের লোক আছে।আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, তিন লক্ষের অধিক ব্যক্তি এই জামাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে এই জামাত সম্পর্কে লোকেরা অবহিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সালেহ ও পুণ্যবান ব্যক্তি।

টীকাঃ আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদা তা'লার এই ইলহাম আমার সম্পর্খে মজুদ আছে। ইহা ঐ যুগের ইলহাম যখন আমি গোপনে জীবন যাপন করিতেছিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও কয়েকজন পরিচিতি ব্যক্তি ছাড়া কেহ আমাকে চিনিত না। ঐ ইলহামটি এই যে,

অর্থাৎ তুমি আমার তওহীদ ও একত্বেও তুল্য। অতএব ঐ সময় আসিয়া গিয়াছে যে, তোমাকে সর্ব প্রকারের সাহায্য প্রদান করা হইবে। পৃথিবীতে তোমার নাম সম্মানের সহিত ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। নাম ছড়াইয়া দেওয়ার ওয়াদা তওহীদ ও একত্বের সহিত উল্লেখ করা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, প্রতাপ ও সম্মানের সহিত নাম ছড়াইয়া পড়ার প্রকৃত অধিকার এক ও অদ্বি তীয় খোদার। অতঃপর যাহার উপর খোদা তা'লার বিশেষ ফযল হয় সে কেবল আত্মবিলীনতার দরুন খোদা তা'লার তওহীদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্য হইতে দ্বৈততা তিরোহিত হইয়া থাকে। তখন খোদা তা'লা এইভাবে তাহার নাম, সম্মান, প্রতাপ ও মহিমার সহিত ছড়াইয়া দেন, যেমন তিনি নিজের নামকে ছড়াইয়া দেন। কেননা, তওহীদ ও একত্ববাদ এই অধিকার সৃষ্টি করে যে, সে এইরূপ সম্মান লাভ করিবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২,পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭২)

*খুতবার বাকী অংশ...*

দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর সেসব উন্নত নৈতিক গুণাবলী ধারণ ও অবলম্বন করা উচিত যা একজন প্রকৃত মু'মিনের মানদন্ড হয়ে থাকে। দুর্বলতা দূর করার সবসময় চেষ্টা থাকা উচিত। আর এই চেষ্টা করা উচিত যে, আমরা যেন নিজেদের পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ করার চেষ্টা করি। আর এর জন্য মহানবী (সা.) যে নীতি বলেছেন যে, নিজের জন্য যা পছন্দ কর নিজের ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন এসব মানদন্ডে উপনীত হতে পারি। (আমীন)

## ইসলাম এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা মসীহ মওউদ(আঃ) এর দায়িত্ব।

এই যুগে তিনি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) কে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন। এই যুগে আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর যে আক্রমন হয়েছে এবং যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এবং পরবর্ত্তীতে তাঁর শিক্ষার অনুসরণে তাঁর খলীফাগণ জামাতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন । এগুলির যে পরিণাম সামনে এসেছে তা ইসলাম এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা মসীহ মওউদ(আঃ) এর দায়িত্ব। এই যুগে তিনি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) কে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন।এই যুগে আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর যে আক্রমন হয়েছে এবং যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এবং পরবর্ত্তীতে তাঁর শিক্ষার অনুসরণেতাঁর খলীফাগণ জামাতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এগুলির যে পরিণাম সামনে এসেছে তার দু একটি উদাহরণ উপস্থাপন করব। যেন ঐ সব লোকদের কাছে জামাতের কর্মকান্ড পরিস্কার হয়ে যায়, যারা জামাতকে এই অপবাদ দেয় যে, হরতাল না করে এবং তাদের সাথে সম্মিলিত না হয়ে আমরা প্রমাণ করছি যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্বার উপর নোংরা নিক্ষেপ করায় আমরা বেদনার্ত নই।

আমাদের প্রতিক্রিয়া সর্বদা এইরূপ হয় এবং হওয়া উচিত যার দ্বারা আঁ হযরত(সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ এবং কুরআন করীমের শিক্ষা প্রস্ফুটিত হয়ে বেরিয়ে আসে। আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্বার উপর অপবিত্র আক্রমণ হওয়া দেখে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার পরিবর্ত্তে আমরা আল্লাহ তায়ালার সমীপে অবনত হয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা কারী। এখন আমি আঁ হযরত(সাঃ)এর প্রকৃত প্রেমি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর রসুলের প্রতি ভালবাসার সম্ভ্রমবোধের বিষয়ে দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করব।

প্রথম উদাহরণটি আব্দুল্লাহ আথমের, যে একজন খ্রীষ্টান ছিল।সে তার পুস্তকে আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে দাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করে অত্যন্ত অপবিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে একটা বিতর্ক সভা চলছিল।একটা বিতর্ক চলছিল। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন "আমি পনেরো দিন পর্যন্ত বিতর্কে ব্যস্ত ছিলাম। বিতর্ক চলতে থাকে এবং গোপনভাবে আথমের ভৎর্সনার জন্য দোওয়া করতে থাকি। অর্থাৎ যে শব্দ সে ব্যবহার করেছিল তার শাস্তির জন্য।হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন বিতর্ক শেষ হলে আমি তাকে বললাম যে, একটা বিতর্ক তো শেষ হল কিন্তু আরো একটা মোকাবিলা বাকি রইল যেটা খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে।আর সেটা হল আপনি আপনার পুস্তক "আন্দুরুনী বাইবেল" এ আমাদের নবী (সাঃ) কে দাজ্জাল নামে অভিহিত করেছেন। এবং আমি আঁ হযরত(সাঃ) কে সত্য জ্ঞান করি এবং দ্বীনে ইসলামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস রাখি। অতএব এটা সেই মোকাবিলা যার পরিণাম আসমানী সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করবে।এবং সেই আসমানী সিদ্ধান্ত হল এই যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের কথায় মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়পূর্ণ ভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল বলে এবং সত্যের শত্রু, সে আজ থেকে পনেরো মাস অতিবাহিত হবে না,সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তির জীবনকালেই হাবিয়ায় নিপতিত হবে।যদি না সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।অর্থাৎ যদি সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী নবীকে দাজ্জাল বলা থেকে বিরত না হয় এবং ধৃষ্টতা এবং গালমন্দ করা ত্যাগ না করে।এটা এজন্য বলা হল কারণ শুধুমাত্র কোনো ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া পৃথিবীতে শাস্তির পাত্র বলে গণ্য হয়না। বরং ধৃষ্টতা, চপলতা, এবং গালমন্দ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন যে, আমি একথা বলার পরে সে বিবর্ণ হয়ে যায়। মুখমন্ডল পান্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং হাত কাঁপতে আরম্ভ করে।তখন অবিলম্বে সে তার জিহবা বার করে হাত দুটি দিয়ে নিজের কানদুটি ধরে ফেলে এবং হাতদুটি দিয়ে মাথা নড়াতে শুরু করে। যেরূপ একজন অপরাধী ভয়ভীত হয়ে একটি অভিযোগ তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং অনুতাপ ও বিনয়ের সাথে নিজেকে প্রকাশ করে।এবং সে বার বার বলছিল তোবা, আমি এমন অন্যায় ও অসভ্যতা করিনি। এরপর সে কক্ষোনো ইসলামের বিরুদ্ধে বলেনি।

(খুতবা জুমা, ১০ ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir